"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে এখন নাম-রূপের ব্যাধি থেকে সুরক্ষিত থাকতে হবে, কোনো উল্টোপাল্টা কর্মের হিসাব তৈরি না করে কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে"

***প্রশ্নঃ -** ভাগ্যবান বাচ্চারা বিশেষ কোন্ পুরুষার্থের দ্বারা নিজের ভাগ্য তৈরি করে ?*

***উত্তরঃ -** ভাগ্যবান বাচ্চারা সবাইকে সুখী করার পুরুষার্থ করে। মন-বাণী-কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেয় না। শান্ত-শীতল ভাবে জীবনযাপন করলে ভাগ্য তৈরি হয়। এটা হলো তোমাদের স্টুডেন্ট লাইফ, তাই আর অবরুদ্ধ না থেকে অসীম খুশিতে থাকতে হবে।*

***গীতঃ-** তুমিই তো মাতা-পিতা...*

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা সবাই মুরলী শোনে। যেখানে যেখানে মুরলী যায়, তারা সবাই জানে যে ভক্তিতে যাঁর এতো গুনগান করা হয় তিনি কোনো সাকার রূপধারী নন, এগুলো সব নিরাকারের মহিমা। এখন সাকারের দ্বারা নিরাকার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে মুরলী শোনাচ্ছেন। এটাও বলা যাবে যে, আমরা আত্মারা এখন তাঁকে দেখছি। আত্মা অতি সূক্ষ্ম যা এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না। ভক্তিমার্গেও মানুষ জানে যে আত্মা অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু আত্মা আসলে কেমন, সেটা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে না। হয়তো পরমাত্মা-কে স্মরণ করে, কিন্তু তিনি আসলে কেমন ? দুনিয়ার মানুষ এগুলো জানে না। আগে তোমরাও জানতে না। এখন তোমরা বাচ্চারা নিশ্চিত ভাবে জেনেছো যে ইনি কোনো লৌকিক টিচার বা আত্মীয় নন। দুনিয়ায় যেমন অন্যান্য মানুষ আছে, সেইরকম এই ঠাকুরদাদাও একজন ছিলেন। তোমরা যখন 'তুমিই আমার মাতা-পিতা'- বলে তাঁর মহিমা করতে, তখন তোমরা ভাবতে তিনি হয়তো ওপরে রয়েছেন। বাবা এখন বলছেন - আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করেছি, সেই আমিই এনার মধ্যে আছি। আগে তো কতো ভালোবেসে গুনগান করতে, আবার ভয়ও পেতে। এখন তিনিই এই শরীরের মধ্যে এসেছেন। যিনি নিরাকার ছিলেন, তিনি এখন সাকারে এসেছেন। তিনি এখন বসে থেকে বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। দুনিয়ার মানুষ তো জানেই না যে তিনি কিসের শিক্ষা দেন। ওরা তো কৃষ্ণকেই গীতার ভগবান মনে করে। বলে যে সে-ই নাকি রাজযোগ শিখিয়েছিল। আচ্ছা, তাহলে বাবা কি করেছিলেন ? হয়তো তোমরা গান করতে - ' তুমিই আমার মাতা-পিতা', কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কি পাওয়া যায় আর কখন পাওয়া যায়, সেইসব কিছুই জানতে না। গীতা শোনার সময়ে তোমরা মনে করতে যে, কৃষ্ণের কাছ থেকে রাজযোগ শিখেছিলাম এবং এটাও ভাবতে যে, তিনি কবে আবার এসে শেখাবেন। যেহেতু এখন এটা পুনরায় সেই মহাভারতের যুদ্ধের সময়, তাই কৃষ্ণও নিশ্চয়ই থাকবে। নিশ্চয়ই সেই হিস্ট্রি জিওগ্রাফির পুনরাবৃত্তি হবে। দিনে দিনে তোমরা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে। গীতার ভগবান তো অবশ্যই থাকবেন। সেই মহাভারতের যুদ্ধই এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হবে। দেখানো হয়েছে পাণ্ডবরা পাহাড়ে গিয়ে গলে গেছিল। আজকাল দুনিয়ার মানুষও বুঝতে পারছে যে বিনাশ অতি নিকটে। কিন্তু কৃষ্ণ এখন কোথায় ? যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমাদের কাছ থেকে শুনবে যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়, শিব, ততক্ষণ ওরা তো খুঁজতেই থাকবে। তোমাদের বুদ্ধিতে এই বিষয়টা পাকাপাকি ভাবে রয়েছে। তোমরা কখনো এটা ভুলবে না। যেকোনো ব্যক্তিকেই তোমরা বোঝাতে পারো যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়, শিব। এটা তোমরা বাচ্চারা ছাড়া দুনিয়ার আর কেউই বলবে না। যেহেতু গীতার ভগবান রাজযোগ শেখাতেন, তাই এটা থেকেই প্রমাণিত হয় যে তিনি নর থেকে নারায়ন বানাতেন। তোমরা বাচ্চারা জানো যে স্বয়ং ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। সেইরকম নর থেকে নারায়ন বানাচ্ছেন। স্বর্গে তো এই লক্ষ্মী-নারায়নের রাজত্ব ছিল, তাই না ? এখন তো সেই স্বর্গও নেই, সেই নারায়নও নেই আর সেই দেবতারাও নেই। *ছবি দেখে বোঝা যায় যে নিশ্চয়ই আগে কখনো ছিলেন।* তোমরা এখন বুঝেছ যে কত বছর আগে এনারা ছিলেন। তোমরা সঠিকভাবে জেনেছো যে আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে এনাদের রাজত্ব ছিল। এখন তো অন্তিম সময় উপস্থিত। শীঘ্রই লড়াই লাগবে। তোমরা জানো যে স্বয়ং বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তোমরা সবাই সেন্টারে পড়াশুনা করো, আবার অন্যদেরকেও পড়াও। এটা পড়ানোর খুব ভালো পদ্ধতি। ছবির দ্বারা ভালোভাবে বোঝা যায়। আসল কথা হলো - গীতার ভগবান কৃষ্ণ না কি শিব ? দুজনের মধ্যে তো অনেক পার্থক্য রয়েছে। সদগতি দাতা, স্বর্গের স্থাপক এবং পুনরায় আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের প্রবর্তক কে - শিব না কি কৃষ্ণ ? এই তিনটে মুখ্য বিষয়ের ওপরেই মামলা। এই বিষয়গুলোর ওপরেই বাবা জোর দেন। হয়তো অনেকেই নিজের ওপিনিয়ন (মতামত) লিখে দেয় যে এগুলো খুব ভালো বিষয়, কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই। তোমাদেরকে এই মুখ্য বিষয়গুলোর ওপরেই জোর দিতে হবে। এতেই তোমাদের জয় হবে। তোমরা প্রমাণ করে বোঝাও যে ভগবান তো অবশ্যই এক। এমন তো হওয়া সম্ভব নয় - যে

গীতাপাঠ করে শোনায় সেও ভগবান। এই রাজযোগ আর জ্ঞানের দ্বারা ভগবান দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেছিলেন। বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চাদের সাথে মায়ার যুদ্ধ হতেই থাকে। এখনো কেউই কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করেনি। পুরুষার্থ করতে করতে অন্তিমে তোমরা কেবল বাবার স্মরণে থেকে হাসিখুশি থাকবে। একটুও ঝিমুনি ভাব থাকবে না। এখন তো মাথার ওপর অনেক পাপের বোঝা রয়েছে। সেগুলো তো স্মরণের দ্বারা-ই নামবে। বাবা পুরুষার্থ করার পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। স্মরণের দ্বারা-ই পাপ নাশ হয়। অনেক বুদ্ধু আছে যারা স্মরণে থাকে না বলে নাম-রূপে ফেঁসে যায়। *তখন হাসিমুখে কাউকে জ্ঞান বোঝানোটাও কঠিন হয়ে যায়।* হয়তো আজকে বোঝালো, কিন্তু কালকেই আবার দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য খুশি চলে যায়। বুঝতে হবে যে মায়া যুদ্ধ করার চেষ্টা করছে। তাই বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হবে। এছাড়া কোনো কান্নাকাটি, মারধর কিংবা নাজেহাল হওয়ার ব্যাপার নেই। বুঝতে হবে যে মায়া জুতাপেটা করছে। তাই বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হবে। বাবার স্মরণে থাকলে অনেক খুশি থাকবে। ঝট করে মুখ দিয়ে উপযুক্ত কথা বেরিয়ে আসবে। স্বয়ং পতিত-পাবন পিতা বলছেন - আমাকে স্মরণ করো। এমন একজন মানুষও নেই যার কাছে রচয়িতা বাবার পরিচয় আছে। মানুষ হয়ে যদি বাবাকেই না জানল, তবে তো জন্তুর থেকেও অধম হয়ে গেল। *গীতাতেই তো কৃষ্ণের নাম যুক্ত করে দিয়েছে, তাই বাবাকে কিভাবে স্মরণ করবে ! এটা খুব বড় ভুল। তোমাদেরকে এটা বোঝাতে হবে। শিববাবা-ই হলেন গীতার ভগবান, তিনিই উত্তরাধিকার দেন। তিনিই হলেন মুক্তি এবং জীবনমুক্তির দাতা।* এই কথাগুলো অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বুদ্ধিতে ধারণ হয় না। ওরা তো হিসাব-পত্র মিটিয়ে ফেরৎ চলে যাবে। অন্তিমে যদি সামান্য পরিচয়ও পায়, তবুও তারা নিজের ধর্মেই যাবে। তোমাদেরকেই বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা দেবতা ছিলে এবং এখন বাবাকে স্মরণ করার ফলে পুনরায় দেবতা হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও উল্টোপাল্টা কাজকর্ম হয়ে যায়। পত্রতে বাবাকে লেখে যে আজ আমার অবস্থা একেবারে নিস্তেজ ছিল, বাবাকে স্মরণ করা হয়নি। স্মরণ না করলে তো অবশ্যই ঝিমিয়ে থাকবে। এটা তো মৃত মানুষদের দুনিয়া। এখানে সকলেই মৃত। এখন তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছ। তাই বাবার নির্দেশ হলো- আমাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। এটা তো পুরাতন তমোপ্রধান শরীর। অন্তিম পর্যন্ত কিছু না কিছু তো হতেই থাকবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবার স্মরণে থেকে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করছো, ততক্ষণ মায়া হেলাতে থাকবে, কাউকে ছাড়বে না। বিচার করে দেখতে হবে যে মায়া কিভাবে ধাক্কা দিচ্ছে। *কখনোই এটা ভুলে যাওয়া যাবে না যে স্বয়ং ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন।* আত্মা বলে - বাবা হলেন আমার প্রাণের থেকেও প্রিয়। তাহলে এইরকম বাবাকে তুমি ভুলে যাও কেন ? বাবা তো দান করার জন্য ধন-সম্পত্তি দিচ্ছেন। প্রদর্শনী কিংবা মেলাতে তোমরা অনেকজনকে দান করতে পারো। নিজে থেকেই আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে যেতে হবে। এখন তো গিয়ে বোঝানোর জন্য বাবাকে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করতে হয়। যারা ভালোভাবে বুঝেছে, ওখানে তাদেরকেই প্রয়োজন। দেহ-অভিমানীর তীর তো কার্যকরী হবে না। অনেক রকমের তলোয়ার থাকে। তোমাদের যোগরূপী তলোয়ার খুব ধারালো হতে হবে। প্রবল আগ্রহ নিয়ে সার্ভিস করতে হবে। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে অনেকের কল্যাণ করব। এত বেশি বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে যাতে অন্তিমে কেবল বাবা ছাড়া আর কারোর কথা মনে না আসে। তাহলেই তোমরা রাজত্বের অধিকারী হবে। অন্তিম সময়ে যে বাবাকে আর নারায়ণকে স্মরণ করবে...। বাবা এবং নারায়ণ (উত্তরাধিকার)-কে স্মরণ করতে হবে। কিন্তু মায়াও কম নয়। অনেক বাচ্চাই কাঁচা থেকে যায়। *যখন কারোর নাম-রূপে ফেঁসে যায়, তখনই উল্টোপাল্টা কর্মের হিসাব তৈরি হয়। একে অন্যকে ব্যক্তিগত ভাবে চিঠি লেখে। দেহধারীর সঙ্গে ভালোবাসা হলেই উল্টোপাল্টা কর্মের হিসাব তৈরি হয়।* বাবার কাছে খবর তো আসে। উল্টোপাল্টা কাজ করার পর বলে - বাবা, এইরকম হয়ে গেছে। কিন্তু উল্টোপাল্টা কর্মের হিসাব তো তৈরি হয়েই গেল, তাই না ? এটা তো পতিত শরীর, এটাকে স্মরণ করছো কেন ? বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ করলে সর্বদা খুশিতে থাকবে। আজকে হয়তো খুশি আছো, কিন্তু কালকেই আবার দুঃখী হয়ে যাবে। জন্ম-জন্মান্তর ধরেই তো নাম-রূপে ফেঁসে এসেছ। স্বর্গে এইরকম নাম-রূপে ফেঁসে যাওয়ার রোগ থাকবে না। ওখানে আত্মীয়দের মধ্যে কোনো মোহ থাকবে না, সকলেই জানবে যে আমি আত্মা, শরীর নয়। ওই দুনিয়াটাই আত্ম-অভিমানীদের দুনিয়া। এটা তো দেহ-অভিমানের দুনিয়া। তারপর অর্ধেক কল্পের জন্য তোমরা দেহী-অভিমানী হয়ে যাও। বাবা এখন বলছেন - দেহ-অভিমান ত্যাগ করো। দেহী-অভিমানী হলে অনেক মিষ্টি এবং শান্ত স্বভাবের হয়ে যাবে। কিন্তু এইরকম খুব কমজনই রয়েছে। পুরুষার্থ করানো হয় যাতে বাবাকে স্মরণ করতে না ভুলে যায়। বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন - আমাকে স্মরণ করো এবং চার্ট রাখো। কিন্তু মায়া তো চার্টও রাখতে দেয় না। এইরকম মিষ্টি বাবাকে কতোই না স্মরণ করা উচিৎ। ইনি হলেন সকল পতির পতি এবং সকল পিতার পিতা। বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং তার সঙ্গে অন্যদেরকেও নিজের সমান বানানোর পুরুষার্থ করতে হবে। এক্ষেত্রে খুব রুচি থাকতে হবে। সেবাধারী বাচ্চাদেরকে তো বাবা চাকরি থেকে মুক্ত করে দেন। পরিস্থিতি অনুসারে বলবেন যে এবার এই কাজেই লেগে যাও। এম অবজেক্ট তো সামনেই আছে। ভক্তিমার্গেও তো ছবির সামনে বসে স্মরণ করে। তোমাদেরকে কেবল নিজেকে আত্মা অনুভব করে পরমাত্মা পিতাকে স্মরণ করতে হবে। বিচিত্র হয়ে বিচিত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এটাই পরিশ্রমের কাজ। বিশ্বের মালিক হওয়া কি মুখের কথা ? বাবা বলছেন -

আমি কখনো বিশ্বের মালিক হই না, তোমাদেরকেই বানাই। কত পরিশ্রম করতে হয়। যারা সুপুত্র হবে, তাদের তো আন্তরিক ইচ্ছে থাকবে, ছুটি নিয়েও সার্ভিস করতে হবে। কিছু বাচ্চার তো বন্ধনও আছে, আবার মোহও রয়েছে। বাবা বলছেন - তোমাদের সমস্ত রোগ বাইরে বেরিয়ে আসবে। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। মায়া তোমাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। স্মরণ হলো মুখ্য বিষয়। তোমরা তো রচনা আর রচয়িতার জ্ঞান পেয়ে গেছ, আর কি চাই ? ভাগ্যবান বাচ্চারা সবাইকে সুখী করার চেষ্টা করে, মন-বাণী-কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেয় না। খুব শান্ত স্বভাবের হয়ে থাকলেই ভাগ্য তৈরি হয়। যদি কেউ বুঝতে না পারে, তাহলে বোঝা যায় যে তার ভাগ্যেই নেই। যার ভাগ্যে থাকবে, সে তো ভালোভাবে শুনবে। অনেকে অনুভব শোনায় যে আগে কি কি করত। এখন জেনেছো যে, যাকিছু করেছ, তার দ্বারা দুর্গতিই হয়েছে। বাবাকে স্মরণ করলেই সদগতি পাওয়া যাবে। *অনেক চেষ্টা করে হয়তো কেউ আধঘন্টা কিংবা একঘন্টা স্মরণ করে। নয়তো ঢুলতে থাকে।* অর্ধেক কল্প ধরে এইরকম করে এসেছ। এখন তোমরা বাবাকে পেয়েছ, এটা তোমাদের স্টুডেন্ট লাইফ। তাই কত খুশি হওয়া উচিত। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বাবাকে ভুলে যায়। বাবা বলছেন, তোমরা হলে কর্মযোগী। ওইসব কাজকর্ম তো করতেই হবে। ঘুমের পরিমাণ কমিয়ে দিলে ভালো হয়। স্মরণের দ্বারা-ই উপার্জন হবে, খুশিতে থাকবে। তাই স্মরণ করতে বসা অতি আবশ্যক। দিনের বেলা তো সময় পাওয়া যায় না, তাই রাত্রে সময় বার করতে হবে। স্মরণের দ্বারা অনেক খুশি আসবে। যদি কারোর কোনো বন্ধন থাকে, তাহলে সে বলে দিতে পারে যে আমাকে তো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে, এতে তো কেউ বাধা দিতে পারে না। গভর্নমেন্টের কাছে গিয়ে বোঝাও যে বিনাশ অতি নিকটে। বাবা বলছেন - আমাকে স্মরণ করলেই বিকর্মের বিনাশ হবে এবং এই শেষ জন্ম পবিত্র থাকতে হবে। তাই আমরা পবিত্র রয়েছি। কিন্তু সে-ই এইভাবে বলতে পারবে যে জ্ঞানের মস্তিতে থাকবে। এমন নয় যে এখানে আসার পর আবার দেহধারীকে স্মরণ করতে থাকলে। দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে লড়াই ঝগড়া করলে ক্রোধরূপী ভূতের মতো হয়ে যায়। *বাবা তো ক্রোধান্বিত ব্যক্তিদের দিকে ফিরেও তাকান না।* সেবাধারীদের সঙ্গেও ভালোবাসা হয়ে যায়। দেহ-অভিমানী চাল-চলন দেখা যায়। বাবাকে স্মরণ করলেই ফুলের মতো হতে পারবে। এটাই মুখ্য বিষয়। একে অপরকে দেখার সময়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সেবার জন্য তো নিজের অস্থি পর্যন্ত অর্পণ করতে হবে। ব্রাহ্মণদেরকে নিজেদের মধ্যে ক্ষীরের মতো থাকতে হবে। কখনোই নুনজলের মতো হওয়া উচিত নয়। বোধশক্তি না থাকার কারণে একে অপরকে ঘৃণা করে, বাবাকেও ঘৃণা করতে শুরু করে। এরা আর কেমন পদ পাবে ! তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হবে। তখন মনে পড়বে যে আমি এইসব ভুল করেছিলাম। বাবা বলেন - কারোর যদি ভাগ্যেই না থাকে, তবে সে আর কি করবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বন্ধনমুক্ত হওয়ার জন্য জ্ঞানের আমোদে (মস্তিতে) থাকতে হবে। দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে কোনো আচরণ যেন না হয়। নিজেদের মধ্যে নুনজলের মতো (খিটমিট) হয়ে থাকার সংস্কার যেন না থাকে।

২) কর্মযোগী হয়ে থাকতে হবে এবং তার সঙ্গে অবশ্যই বসেও স্মরণ করতে হবে। আত্ম-অভিমানী হয়ে খুব মিষ্টি এবং শান্ত স্বভাবের হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। সেবাতে নিজের অস্থি পর্যন্ত অর্পণ করতে হবে।

বরদানঃ- একনামী এবং ইকনমি-র শিক্ষা দ্বারা ঝামেলার মধ্যেও অচল-অটল ভব*

সময় অনুসারে বায়ুমন্ডলে অশান্তি আর ঝামেলা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইরকম সময়ে অচল-অটল থাকার জন্য বুদ্ধির লাইন খুব ক্লিয়ার থাকতে হবে। এরজন্য সময় অনুসারে টাচিং এবং ক্যাচিং পাওয়ারের প্রয়োজন। এগুলো বাড়ানোর জন্য একনামী এবং ইকনমি করতে শেখো। যেসব বাচ্চারা একনামী এবং ইকনমি করে, তাদের বুদ্ধির লাইন সর্বদাই ক্লিয়ার থাকার জন্য বাপদাদার নির্দেশ সহজেই ক্যাচ করতে পারে এবং ঝামেলার মধ্যেও অচল-অটল থাকে।

স্লোগানঃ- সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কামনাগুলোকে পরিত্যাগ করলেই যেকোনো বিষয়ের মোকাবিলা করতে পারবে।*